International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-VII, August 2016, Page No. 1-5
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

বিবেকানন্দ ও বিশ্বজনীন ধর্ম

কল্যাণ ব্যানার্জী
দর্শন বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

This Short discourse is an attempt to highlight the ideology of Universal Religion according to Swami Vivekananda. He believes in Culture, Service, Humanism and Love. To him religion means Universal Religion (Biswajanin Dharma), It is not like Hinduism, Christianity, Islam, Jainism, Buddhism etc. According to him Religion should be based on Humanity and Love, and also free from any types of superstitions. In Ordinary sense religion is a ritual. Vivekananda tries to overcome this ordinary sense and upholds religion as a Culture of Service, Humanity and Love. Universal Religion cannot be limited by any religious dogmatism. In this short article I have focused Universal Religion in the light of Vivekanandas Philosophy

বাংলা তথা ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান। আমাদের এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছেন সেই সকল বীর সন্তানেরা যাঁরা এমন এক সমাজ সংস্কারের বার্তা বহন করে এনেছিলেন যা বাংলা তথা ভারতবর্ষকে বিশ্বের মানচিত্রে এক অনন্য স্থান করে দিয়েছে। বাংলার এই সকল বীর সন্তানেরা হলেন ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ। এই সকল চিন্তানায়কগণের হাত ধরে এই সংস্কারের ধারা ক্রমে এক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। তাঁরা সমাজ সংস্কারের এই আন্দোলনকে এক নতুন খাতে এগিয়ে নিয়ে যান। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে চলে এই আন্দোলন। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে নানা অন্ধ কু-সংস্কার, বিভিন্ন লোকাচার, নানা সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার হয়, ধাক্কা খাই চিরাচরিত ধর্মীয় ভাবনা যেগুলি ছিলো আদতে ধর্মের নামে সামাজিক অত্যাচার। ভীত-সন্ত্রস্ত, ভন্ড মুখোশধারী তৎকালীন ধার্মিকেরা এই সকল চিন্তানায়কদের বিরুদ্ধে নানা আঘাত প্রতিঘাত হেনেও শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। আর ঠিক এই সময়েই এক নতুন জীবনাদর্শ নিয়ে আবির্ভূত হলেন বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি সামাজিক সংস্কারের প্রচেষ্টাকে এক অভিনব আঙ্গিকে ঢেলে সাজালেন। সমাজ সংস্কারের ধারা যখন বিভিন্ন কূপ্রথা ও নানা লোকাচারের দ্বারা ব্যাহত হচ্ছিল তখন বিবেকানন্দের সংস্কারবার্তা ঐ সংস্কার ধারা কে নতুন প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরে দেয়। বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন সমাজ সংস্কারের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ধর্ম সংস্কারের। একারণেই তিনি মানুষের মনে ধর্মীয় প্রেরণা উদ্ভাবনের উপর বিশেষ জোর দেন। বিবেকানন্দ মনে করতেন ধর্ম হল সমাজদেহের একটি অঙ্গ বিশেষ। তিনি তাঁর এই অনুভূতিকে সমাজ সংস্কারের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে একদিকে সমাজ গঠনের ধর্মের ভূমিকা ও ধর্মের বিশ্বজনীনতা বিষয়ে বিবেকানন্দের উপলব্ধির দিকটি প্রতিফলিত হবে।

বিবেকানন্দ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী কলকাতার এক শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা বিশিষ্ট আইনজীবী ও বিদ্যানুরাগী। মা-ও ছিলেন মহীয়সী মহিলা। বাবা-মায়ের তত্ত্বাবধানেই ছোট্ট নরেনের বড় হয়ে ওঠা।

খুব ছোটতেই সনাতনী শিক্ষার সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, তাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ঐতিহ্যের সঙ্গেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন তিনি। স্বভাব চঞ্চল ও কৌতুহলী নরেন বাল্যকাল থেকেই অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ও পারিবারিক বর্ণাশ্রম প্রথার বিরুদ্ধাচারণ করতে শুরু করেন। প্রবল যুক্তিবাদী ভাবধারায় দীক্ষিত নরেন জগৎ ও জীবনের নানা প্রশ্ন নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চালান। অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ান নানা মহলে। খোঁজ করে বেড়ান নানা প্রশ্নের যুক্তি সম্মত সমাধান। এমন সময়ই অস্থির মতি নরেন দেখা করেন পরম প্রেমময় ঠাকুর 'শ্রী রামকৃষ্ণের' সঙ্গে। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে তার চিত্ত চাঞ্চল্য একেবারেই দূরীভূত হয়। রামকৃষ্ণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নরেনের জীবনে নিয়ে আসে এক অমোঘ শান্তি। বিষয়ভোগ, বাসনা, কামনা, চিত্তচঞ্চলতা, সংশয় পরিহার করে প্রেমময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। গ্রহণ করলেন সন্ন্যাস ব্রত। নরেনের নাম হল বিবেকানন্দ।

এক অদম্য জেদ, দুর্জয় সাহস ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদকে পাথেয় করে শুরু হল আর নতুন জীবন। প্রবল প্রাণপ্রাচুর্য, আত্মবিশ্বাস, ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদকে হাতিয়ার করে ঘুরে বেড়ান দেশ হতে দেশান্তরে। তাঁকে কোন প্রাচীর বা কোন বেষ্টনি কোন দিনই আবদ্ধ করতে পারেনি। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অন্ত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাবে জ্ঞানগর্ভ ভাষণের মাধ্যমে অর্জন করেন বিপুল জনপ্রিয়তা। লাভ করেন অনন্য খ্যাতি। তাঁর এই জনপ্রিয়তা বা খ্যাতি কোনদিনই তাকে অহংকারী করে তোলেনি, আর এখানেই বিবেকানন্দের অনন্যতা। তিনি উপলব্ধি করলেন সমগ্র মানব জাতিকে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক মাত্র হাতিয়ার হল ধর্ম। ধর্মই হল মানব কল্যানের উৎস। একমাত্র ধর্মপথেই মানুষকে দেবত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। বিবেকানন্দের জীবনে ধর্ম ভাবনা নতুন কিছু নয়, এই ধর্মে শুনতে পাওয়া যায় এক মহা ঐক্যের বাণী যার উৎস হল বেদ-উপনিষদ-গীতা তথা পৃথিবীর সবকটি প্রাচীন ধর্ম। বিবেকানন্দের ধর্ম ভাবনায় যৌক্তিক ভাষ্য ও বিবরণ পাওয়া যায় যে কোন যথার্থ মানবতাবাদী দর্শনে। মানবতাবাদী ধর্ম, যা সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত সারবত্তার উপর ভিত্তি করেই রচিত, তা নির্দিষ্ট কোন ধর্মের প্রতিযোগী নয়। এ এক বিশ্বজনীন মানবতাবাদী ধর্ম, যে ধর্মে নিহিত হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের মূল সত্য। তিনি মনে করতেন বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও একটি অপরটির থেকে পৃথক নয়, পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। বিবেকানন্দ উপলব্ধি করলেন মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ ছাড়া মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তা আসবেনা। আর একমাত্র চারিত্রিক দৃঢ়তাই মানুষকে উত্তরণের পথ দেখাতে পারে। আধ্যাত্মিক বিকাশ মানে ঈশ্বর ঈশ্বর করে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ানো নয়, আধ্যাত্মিক বিকাশ তখনই সম্ভব যখন মানুষ উপলব্ধি করতে শেখে মানুষের সেবায়, মানুষের কল্যাণেই নিহিত আছে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ।

ধর্মের নামে হানাহানি, রক্তপাত, হিংসা এসব এখন অতিসাধারণ ব্যাপার। সংবাদপত্রে বা টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখলেই একথার সত্যতা যাচাই করে নেওয়া যাবে। ধর্মের নামে গ্রামছাড়া অনেক পরিবার রাজ্যছাড়া অনেক রাজ্যবাসী, এমনকি ধর্মের নামে দেশভাগের কথাও আমাদের অজানা নয়। একারণেই আমরা প্রায় সকলেই মনে করি ধর্ম বিষয়টি ভীষণই স্পর্শকাতর। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ কোন দিনই এই স্পর্শকাতর ধর্মের কথা ভাবেন নি, বা বলেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে ধর্ম তখনই স্পর্শকাতর হয় যখন তা গোঁড়ামিতে পরিপূর্ণ থাকে, যখন ভন্ড ধার্মিকেরা ধর্মের দোহায় দিয়ে ঈশ্বর লাভের আশায় ঈশ্বরকে খোঁজেন গণ্ডিবদ্ধ চার দেওয়ালের কোণে। তিনি মনে করতেন, যে ধর্ম রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা সেই ধর্ম স্পর্শকাতর। তবে বিবেকানন্দের ধর্ম ভাবনায় যে ধর্মের ছবি ফুটে উঠেছে তা মোটেই রহস্য রোমাঞ্চে ভরা স্পর্শকাতর ধর্ম নয়, এধর্ম সৎ, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শুদ্ধতায় পরিপূর্ণ। তাঁর কথায় "পরোপকারই ধর্ম পরপীরণই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে ভালোবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বরে ও নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ দর্শনই ধর্ম, ভেদ-দর্শনই পাপ।" (আমার ভারত অমর ভারত, স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ- ৯০) ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে যে বিশ্ব-ধর্ম মহাসম্মেলন বসেছিলো সেখানেই ধর্ম সম্পর্কে বিবেকানন্দের ভাবনা মহামন্ত্রধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়েছিলো। রোমাঞ্চিত হয়েছিলো সমগ্র বিশ্বসংসার। তবে এই

মহামন্ত্র ধ্বনি মোটেই রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা কোন ধর্মের বাণী রূপে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছয়নি, পৌঁছেছিলো বিশ্বভাতৃত্বের বাণীহিসেবে। ঐতিহ্যমন্ডিত ভারতবর্ষের সংস্কৃতির পরিচয় ছড়িয়ে পড়ল দেশ থেকে দেশান্তরে, যেন মানবতাবোধের স্নিগ্ধ স্পর্শে সমগ্র বিশ্ব তখন উদ্ধেলিত। একদিকে আধ্যাত্মিক ও অন্যদিকে প্রেম শক্তিতে বলীয়ান এমন এক ধর্মের বাণী বিবেকানন্দের কণ্ঠে সেদিন উচ্চারিত হয়েছিলো তা ভারত তথা বিশ্ববাসী কোন দিনই ভুলতে পারবেনা। বিবেকানন্দ প্রেম, সেবা ও মানবতাবাদী আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন পরম প্রেমময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। শ্রী শ্রী ঠাকুরের সান্নিধ্যে স্বামীজি উপলব্ধি করেছিলেন প্রেম ও সেবার মধ্যেই মানবতার বীজমন্ত্র লুকিয়ে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সরল প্রেম ও ভক্তিময় সান্নিধ্যে নরেন্দ্রনাথ রূপান্তরিত হলেন বিবেকানন্দে। তাঁরই কাছে মানবতা ও সেবাধর্মে দীক্ষিত হয়ে নিজেকে আবিষ্কার করলেন। অনুভব করলেন নিজের মধ্যে এক অদম্য শক্তির স্ফুরণ। উপলব্ধি করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ বাণী। শ্রীরামকৃষ্ণের মানবতা, ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে সারা বিশ্বে প্রচার করেছিলেন। "যত্র জীব তত্র শিব"—এই উপলব্ধিকে সামনে রেখে স্বামীজি ঘোষণা করলেন—

> "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
> জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

এই আদর্শের আলোকে তিনি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই অর্থেই বিবেকানন্দ জীবকে শিব আখ্যা দিয়েছেন। জীবের মধ্যেই শিবের অবস্থান, জীব ব্যাতিরেকে শিবের কোন সত্তা নেই, জীবের দুঃখ, জীবের সুখই শিবের সুখ। উপনিষদের ভাষায় সর্বাত্মভাব। বিবেকানন্দ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেন জীব সেবার মধ্যেই ঈশ্বর সেবা নিহিত। আলাদা করে ঈশ্বরের খোঁজ করার চেষ্টার মধ্যে কোন মহত্ব নেই, বরং ঈশ্বর জ্ঞানে জীবকে দেখার মধ্যেই মহত্ব নিহিত। জীব সেবাকে ভিত্তি করে বিবেকানন্দ যে ধর্ম প্রচার করেছেন তা স্পষ্টতঃই মানবতাবাদী ধর্ম। যা এক উচ্চ আদর্শের সোপান। এই আদর্শই তিনি সারা জীবন ধরে প্রচার করে বেড়িয়েছেন দেশে বিদেশে। তাঁর এই মানবতাবাদী জীবনাদর্শের উপর ভর করে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব। বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন সমাজ সংস্কারের জন্য দরকার মানুষের প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা। মানুষের চেয়ে বড় আর কিছু হয় না। শ্রদ্ধা করতে হবে ধনি-গরীব নির্বিশেষে। শ্রদ্ধা তখনই সার্থক হয় প্রেম ও সেবার আদর্শে।

ধর্ম মানুষকে ধারণ করে। মানুষ ধর্মের ধারণ ক্ষমতাকে অবহেলা করেছে, ধর্মের ধারণ ক্ষমতাকে ভুলে গিয়ে ধর্মের নামে দ্বন্দ্ব, হিংসা, বিদ্বেষ ছড়িয়েছে। এর ফলে ক্ষতি হয়েছে মানুষের, ধর্মের কোন ক্ষতি হয়নি। ধর্ম নিষ্ঠুর হয়না, নিষ্ঠুর হয় মানুষ। ধর্মপ্রভাবে মানুষ প্রশান্তি লাভ করে, নিষ্ঠুর মানুষ শান্ত-স্বভাব প্রাপ্ত হয়, ধর্ম মানুষকে সংযত হতে শেখায়। কিছু মতলবি, কুরুচি-পূর্ণ মানুষ নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য ধর্মের দোহায় দিয়ে তারই আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে প্রতারণা করে। ধর্মই মানুষকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে, এই একসূত্রে গ্রথিত করে রাখা ধর্ম কোন মুখোশের আড়ালে আবৃত ধর্ম নয়, এ ধর্ম মানবতার ধর্ম, মনুষ্যত্বের ধর্ম, এ ধর্ম বিশ্বজনীন ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ এই বিশ্বজনীন ধর্মের জয়গান গেয়েছেন। এই ধর্মের বাণী প্রচার করতে গিয়ে তাঁর কণ্ঠ কখনো রুদ্ধ হয়নি। দুর্জয় সাহসিকতা, দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে সমগ্র বিশ্বে তিনি এই ধর্মের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই ধর্ম শান্তির বার্তা হয়ে বিশ্বজুড়ে মানুষের মনকে স্পর্শ করেছে, বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত ধর্মব্যবস্থার প্রতি কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করেননি। তিনি চেয়েছিলেন এমন এক সমাজব্যবস্থার পত্তন করতে যার ভিত্তি হবে ধর্ম। তবে এই পথ যে কুসুম-কোমল হবেনা তা বিবেকানন্দ বিলক্ষণ জানতেন। আর তার জন্যই তিনি প্রথমেই চেয়েছিলেন কিছু ধর্মীয় সংস্কার করতে। আর ধর্মীয় সংস্কার ভিন্ন সমাজ সংস্কার যে সম্ভব নয় একথাও তাঁর অজানা ছিলোনা। কিভাবে ধর্মসংস্কারের মধ্য দিয়ে সমাজসংস্কারের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়, বা কিভাবে বা আদর্শ সমাজ গঠিত হয় এই নিয়েই স্বামীজির নিরন্তর গবেষণা। এই গবেষণার গবেষণাগার কোন বদ্ধ ল্যাবরেটরি নয়, তিনি গবেষণাগার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন সমগ্র জগৎ সংসারকে, বলা যেতে পারে বিশ্ব

সংসারকে। তাঁর মনে হয়েছিলো সমাজসংস্কারের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ধর্মসংস্কারের। প্রয়োজন মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ। তবে এই চেতনা কোন অলৌকিক চেতনা নয়, এহল এক চরম বাস্তব ও নৈতিক চেতনা। মানুষের মনে ধর্মীয় প্রেরণার জাগরণ ছাড়া সমাজসংস্কার অসম্ভব। তাঁর উপলব্ধিতে ধরা পড়েছিলো আর এক সত্য, আর এই সত্যটি হলো এই ধর্ম কোন অলৌকিক বা অতিলৌকিক ধর্ম নয় বা এধর্ম হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধধর্ম নয় এ-ধর্ম সেবাধর্ম, মানবধর্ম। বিবেকানন্দের ধর্মভাবনা দাঁড়িয়ে আছে সত্য, প্রেম ও সেবা এই তিনটি স্তম্ভের উপর। যে ধর্ম সত্য, প্রেম ও সেবাকেন্দ্রিক সে ধর্মই আধুনিক ধর্ম। সত্য, প্রেম ও সেবার মধ্যে লুকিয়ে আছে এমন এক শক্তি যা সমগ্র মানব জাতিকে পরিপূর্ণ আধুনিকতা প্রদান করতে পারে। বিবেকানন্দের ধর্মচেতনায় আধুনিকতা কখনই অধ্যাত্মবাদকে বাদ দিয়ে নয়। আধুনিক মানুষ ধর্মকে বাদ দিয়ে হতে পারেনা। মানুষ আজ আধুনিক হয়েছে মানে সে আজ চেতনার নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। চেতনার এই উত্তরণ সব থেকে চূড়ান্ত হয়েছে ধর্মের ক্ষেত্রে। তাঁর মনে হয়েছিল মানুষের জীবন দাঁড়িয়ে আছে ধর্মীয় ভিত্তির উপর। তাই সামাজিক সংস্কার করতে হলে অগ্রসর হতে হবে ধর্মকে পাথেয় করেই। তিনি মনে করতেন ধর্মের পথই হল সব থেকে সহজ, নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন। তাই এই পথেই অগ্রসর হওয়াই অধিকতর যুক্তিসম্মত। তবে তাঁর চেতনায় উদ্ভাসিত ধর্ম কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠী চেতনার ধারক বা বাহক নয়। তাঁর কাছে ধর্ম হল মানবতা, তথা মানব ধর্ম। যে ধর্ম সমগ্র মানব জাতির ধারক। বিবেকানন্দ সমগ্র মানব জাতির ধারক রূপে যে ধর্মের কথা বলেছেন তাহল – বিশ্বজনীন ধর্ম। বিবেকানন্দ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে এই বিশ্বজনীন ধর্মেরই জয়গান গেয়েছেন। তিনি ধর্মের বিশ্বজনীনতাকে মানুষের সামনে তুলে ধরলেন। তাঁর এই বিশ্বজনীন ধর্ম আদ্যপান্ত মানবসর্বস্ব। ধর্মের এই মানবসর্বস্বতার ব্যাখ্যায় তিনি বললেন ধর্ম হল অসৎ থেকে সৎ-এ উত্তরণ, অন্ধকার থেকে আলোতে প্রবেশ, কুসংস্কারের পথ থেকে সংস্কারের পথে যাওয়া, এবং এই পথে যেতে হবে সকলকে সঙ্গে নিয়ে, কাউকে বর্জন করে নয়। যে ধর্ম শুধু কোন সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে থাকে সেখানে থাকে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও ধর্মের নামে হিংসা। স্বামীজির দৃষ্টিতে ধর্মীয় গোঁড়ামির উর্ধে উঠতে হবে, এমন এক ধর্মের পাঠ সমগ্র বিশ্ববাসীর কানে পৌঁছে দিতে হবে যে ধর্মে ধ্বণিত হবে মানবতার জয়গান, উচ্চারিত হবে সনাতন সংস্কারের অমোঘ বাণী। ধর্ম জাদুর মতো চমৎকৃত করবেনা বরং তা সূর্যের দীপ্ত শিখার মতো বিশ্বকে আলোকিত করবে।

বিচিত্র এই বিশ্বে বহুবিধ ও বিচিত্র ধর্মের আস্ফালন, কিন্তু ধর্মের নামে এই আস্ফালন মানুষে মানুষে বিভেদ বা বৈরীতা ছাড়া কিছুই বাড়াতে পারেনা। একমাত্র বহুবিধ ধর্মের মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই হতে পারে বিশ্বভাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। আর এই বিশ্বভ্রাতৃত্বই হতে পারে বিশ্বজনীনধর্মের আগমনি বার্তার প্রবেশদ্বার। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মীয় ভাবনা আমাদেরকে এইপথে চলার রাস্তাটি সুগম করে দিয়েছে। বিবেকানন্দের ধর্মভাবনায় নিহিত ছিল এক মহা একত্ব, যার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় পরম সত্তাকে। এমতে জগতের সকল বৈচিত্রের মূলে রয়েছেন এই পরম সত্তা। যার নাম ভিন্ন কিন্তু সংস্কার এক। এই মহা-একত্ব উপলব্ধি করতে পারলেই কেষ্ট আর খ্রীষ্টে তফাৎ খুঁজে পাওয়া যাবেনা। কালী, শিব, ব্রহ্মা, আল্লাহ, গড নামের এই ভিন্নতা বা ভেদ যে শুধু আপেক্ষিক তা বুঝতে কোন অসুবিধা হবেনা। আসলে ধর্মের নামে যাঁর মানুষকে বিভাজিত করতে চায় তারা এই ভিন্নতার মিথ্যে গল্প শুনিয়ে মানুষকে মোহিত করে রাখেন। কিন্তু যাঁর মহা একত্বের উপলব্ধি হয়েছে তাঁর ভিন্নতা উপেক্ষিত হয় ও সত্তা যে সেই এক এবং তা যে সেই পরম সত্তা এই বোধই হয়। এই পরম সত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলেই আমরা এই একই এই পরম সত্তা থেকে আগত। বিশ্লেষণে, ভাষায় বিভিন্ন নাম পাওয়া গেলেও ভাবে তা যে এক ও অভিন্ন একথা বুঝতে অসুবিধা হয়না। বিবেকানন্দ মনে করতেন স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন ফাঁক নেই। ক্ষুরের ধার যেমন নিহিত থাকে ক্ষুরে, তেমনি স্রষ্টাও বিদ্যমান থাকেন সৃষ্টিতে। জীব মাত্রই পরম সত্তার অংশ, এভাবেও বলা যায় জীব হল পরম সত্তার সাকার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ মাত্র। আমাদের ভিন্নতা শুধু প্রকাশে, অভিব্যক্তিতে।

বিবেকানন্দের মতে সকল ধর্ম একই সনাতন ধর্মের রূপভেদ মাত্র। বিবেকানন্দ বলেছেন, "আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্যই করিনা, সব ধর্মকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। যে জাতি পৃথিবীর সব ধর্মের ও সব জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী মানুশকে চিরকাল আশ্রয় দিয়ে এসেছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। পরধর্ম বা পরমতের প্রতি শুধু দ্বেষভাব শূন্য হলেই চলবেনা, আমাদেরকে এ ধর্ম বা মতকে আলিঙ্গন ও করতে হবে; সত্য ই সকল ধর্মের ভিত্তি।" (আমার ভারত অমর ভারত স্বামী বিবেকানন্দ পৃষ্ঠা - ৮৬)

বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, ধর্মের বিশ্বজনীনতার মাপকাঠি স্থান কালের গণ্ডি নয়। বিশ্বজনীনতার মাপকাঠি নিহিত থাকে ধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে। ধর্মের স্বভাব নিহিত ধারণ ক্ষমতায়। ধর্ম স্থান কালের আবর্তে ভেসে যায় না, বরং ধর্মই স্থান কাল কে ধারণ করে। ধর্মের ধারণ ক্ষমতা মানুষকে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও প্রেমশক্তিতে বলীয়ান ও পূর্ণ করে তোলে। মানুষকে নীতিবোধ ও মূল্যবোধ সম্পন্ন করে তোলে। বিবেকানন্দ ধর্মের এই শক্তিকে পেশীশক্তি বা দৈহিক শক্তির তুলনায় অনেক বেশি বলীয়ান বলেছেন। তিনি এই ধর্মকে কোন ভাবেই হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলিম বা বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাননি। তিনি যে সবধর্ম সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন তাও নয়। তিনি বলতে চেয়েছিলেন প্রত্যেক ধর্মই এক সনাতন ধর্মের রূপভেদ মাত্র। সর্বধর্মকে একত্রিত করে তিনি কোন ধর্মীয় জোট করতেও চাননি। তিনি প্রতিটি ধর্মের ভিন্নতাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই ভিন্নতা মানে তাঁর কাছে বৈরীতা নয়, বিরোধ নয়, নামের ভিন্নতা অভিব্যক্তির বা প্রকাশের ভিন্নতা মাত্র। প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই এক ও অদ্বিতীয় অন্তর্নিহিত শক্তি বর্তমান। এই শক্তির কোন ভিন্নতা নাই। এই শক্তিকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশ করে থাকি মাত্র। এই শক্তি পরম সত্য যা এক ও অদ্বিতীয়। এই এক ও অদ্বিতীয় পরম শক্তিই বিবেকানন্দের বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ। এই একত্বের আদর্শই মানুষকে ভালবাসতে শেখায়, শ্রদ্ধা করতে শেখায়। কোন একটি বিশেষ ধর্ম-মতকেই বিশিষ্ট অবদান অপেক্ষা বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন প্রত্যেকটি ধর্মমতের সত্যদর্শন ও মানবত্বের উদ্বোধক হবে এরূপ নীতিদর্শন গুলির সারসংকলন করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কোন একটি বিশ্বজনীন ধর্মের রূপ দিতে। আর সর্বধর্ম সম্মিলিত ধর্মটি অবশ্যই এমন হবে যেখানে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা পাই এবং যিনি ঐ বিশ্বজনীন ধর্ম গ্রহণ করবেন তিনি শুধুমাত্র তার বিবেকের অনুমোদনেই ধর্মপালন করবেন। অনুশাসন বলতে শুধুমাত্র বিবেকের অনুশাসন, কোন বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে বা বিশেষ ধর্মীয় অনুশাসনের কাছে মাথা নত করে নয় বীর পরাক্রমে বিবেকের ডাকে সারা দিয়ে বিশ্বজনীন ধর্মের প্রচার করতে হবে। যে ধর্মের আদ্যপান্ত মোড়া থাকবে মানবতায়, প্রেমে ও সেবায়। এধর্ম হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধধর্ম নয় এধর্ম সেবাধর্ম, বিশ্বজনীন-মানবধর্ম। এই বিশ্বজনীন ধর্মের রূপরেখা এমন ভাবে রচিত যা প্রতিটি ধর্মমত ও সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধা করতে শেখায়।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। অমৃতবাণী (বিবেকানন্দের বাণী সংকলন), গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন।
২। আমার ভারত অমর ভারত - বিবেকানন্দ, বেলুড় মঠ।
৩। কর্মযোগ - স্বামী বিবেকানন্দ - উদ্বোধন কার্যালয়।
৪। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন, ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোল্পপার্ক, কলি - ২৯।
৫। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ - শঙ্করী প্রসাদ বসু।
৬। শাশ্বত বিবেকানন্দ, সম্পাদক, নিমাই সাধন বসু, আনন্দ পাবলিশার্স।